ARCHIVE

JUNE 2014

জুন ১, ২০১৪

বাঙালী ছেলের ঘরের দেওয়ালে Elvis Presley বা Bob Marley? পোষাবে না বস। সময়ের সাথে কিছুটা পরিবর্তন হলেও কিছু বছর আগে দেওয়ালে শোভা পেত, অস্ত্রধারী সচিন (পড়ুন ব্যাট), গাঙ্গুলি (যদিও দাদা বা সৌরভটাই আমাদের বেশি পছন্দ), রাহুলদের পোস্টার। ভারতীয় দলের জামা পড়ে গর্বিত চোখে তারা চেয়ে থাকে মুগ্ধ ফ্যানের দিকে। খেলা থাকলে আসমুদ্র হিমাচল এক সুরে সুর মেলাতাম। তার পর হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল প্রাদেশিকতা (বাঙালীদের থেকে বেশি প্রাদেশিক যে এটা শুরু করল)। ঘরে টাঙানো সচিনের কিছুদিনের off-form প্রার্থনা করতেও দ্বিধা হল না। হলই বা সে বিদেশি, আমার শহরের দলে তো খেলে, তাহলেই হল। ধানি লঙ্কার মতো ক্রিকেট এর মধ্যে ঢুকে পড়ল নারীর উষ্ণতা, চার ছক্কার সাথে সেগুলোও উপভোগ্য। এখন ক্রিকেট খেলি সচিন হওয়ার আশায় নয়, পাশের বাড়ির রুমেলা কে Impress করার নেশায়। Umpire এখন আর ব্যাটসম্যানদের কাছে Vampire নয়। আমার ক্ষেত্রে তো নয়ই।ছোটবেলায় বৈকালিক মুক্তির খেলা এখুন এই রঙিন একরকম জীবনে কিছুটা খোলা হাওয়া। ক্রিকেট মানে নাকি ঝিঁঝিঁ?

জুন ২, ২০১৪

একটি কাণ্ড প্রসঙ্গে –

"কোনরকম সাহায্য যদি না করে থাকেন, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেঁদে ককিয়ে ন্যাকামোটা আর করবেন না, অতি লোভে তাঁতি, জেলে, চাষা আর কিছু ছাপোষা বেসরকারি কেরানি নষ্ট হয়েছে তাতে আমার আপনার কি মশাই?

'মানুষের টাকার' মধ্যে যদি আপনার টাকা না থাকে তাহলে আপনার অসুবিধেটাই বা কোথায়? আইপিএল আর বিশ্বকাপের পর মুচমুচে আলোচনার বিষয়বস্তু যখন পরমানন্দ চ্যানেলে পাচ্ছেনই তখন ক্ষেতি টা কি?"

*যদি করে থাকেন তাহলে এই পোস্ট আপনার জন্য নয়।

#আমরাও আপনাদের দলেই

জুন ৩, ২০১৪

আনন্দবাজারকে গাল না পাড়লে ঠিক আঁতেল হওয়া যায় না, পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু সকালবেল ওইটে না পেলে কিছুতেই চা-টা হজম হয় না যে। আসলে আমাদের শহুরে বাঙালীর রক্তে-মজ্জায় ঢুকে গেছে এই সংস্থাটি। তাই তাদের আকাশছোঁয়া দামের বইয়ের স্টলে সবথেকে বেশী ভিড়। শুধুই কি গিমিক? লবিবাজি করে হোক, সুযোগমত পক্ষ পরিবর্তন করে হোক বা খুড়োর কলের মত সামনে খাবার ঝুলিয়ে পাবলিকের নালঝোল ফেলানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা পারে শহুরে শিক্ষিত মানুষের মত বদলাতে। আনন্দবাজার যা ভাবায়, আমরা তাই ভাবি। তারা জানে কবি-লেখকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে, আজও। কাজের মানুষগুলোকে পারে ফুসলিয়ে আনতে। আজও ওই ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটের ঠিকে ঝি-চাকরের কাজ পাওয়ার জন্য অনেকে মরিয়া। তাদের ক্ষ্যামতা আছে অনেকের অনেক বিদ্রুপের তোয়াক্কা না করে বিদঘুটে বানান লিখে যাবার। প্রতিষ্ঠানবিরোধীতাও যে শিখিয়েছে এই আনন্দবাজারই। সেই জাঁতাকল থেকে বেরোনো কি সহজ কথা। আর হ্যাঁ, অনেকেই মজা করছেন, গাল পাড়ছেন আনন্দবাজারে জনৈক

ক্রীড়া সাংবাদিকের কেকেআর সম্পর্কিত মন্তব্য নিয়ে। তার আগে জানুন সেই সাংবাদিকই আজ লিখেছেন, "নিলামের পর লিখেছিলাম, এই অদ্ভুত কম্বিনেশনের কেকেআর আইপিএল জিতলে ঢাকুরিয়া লেক থেকে গলদা চিংড়িও উঠতে পারে। সোমবার দুপুরে ভাবছি লেকের কাছটা এক বার ঘুরে আসব!" এই নিজেকে নিয়ে চূড়ান্ত মজা করাটা তারাই করতে পারেন, সেটা আপনার খিস্তির চেয়ে শতগুণে অভিজাত।

জুন ৩, ২০১৪

'আজ চেন্নাইকে লাগাচ্ছি, চল ৫০০ টাকা বেট।
আমি রাজস্থান, ১০০০ টাকা, লাগা।
আমি কলকাতা, ১ টাকায় ৫ টাকা, বল লড়বি?
এই ওভারে ১০ রান হবে, আমি ১০০।
উইকেট, ২০০।
নো বল, ১৫০।
আমি ৫০০, আমি ২০০, আমি ১০০০, ১৫০০, ৭০০, ৩০০, ৪০০...।'
কাল থেকে এই কথাগুলো আর শোনা যাচ্ছে না চায়ের দোকানে, ট্রেনের কামরায়, বাসের ছাউনিতে। আইপিএল এসে আপামর বাঙালীকে খেলোয়াড় না হোক, জুয়াড়ি বানিয়ে দিয়ে গেল।

জুন ৫, ২০১৪

বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ডান হাতে বলটা শক্ত করে চেপে ধরল অভিরূপ, ওকে এবার পারতেই হবে, অন্য টিমের ব্যাটসম্যান ওরই ওভারে পরপর তিনটে চার মেরেছে, ওদের শেষ ব্যাটসম্যান যে এত ভাল খেলবে কে ভেবেছিল , শেষ ওভারের আর তিন বল বাকি, জেতার জন্য চাই মাত্র পাঁচ রান, প্রতিপক্ষ দলের সবার মুখ বেশ হাসি হাসি। অভিরূপের মত বোলারকে পর পর তিনবার বাউন্ডারি হাঁকাতে পারলে সেই ম্যাচ জেতা নিয়ে কোন সংশয় থাকে কি? যদিও পরের বলেই উইকেট ভেঙে অভিরূপের 'আউজ্যাঅ্যাঅ্যাট' চিৎকারে ভুল ভাঙে সুমনের... ব্যাট হাতে ফিরে যায় আস্তে আস্তে, বর্ণনাটা আইপিএলের রুদ্ধশ্বাস কোন ফাইনালের নয়, মতি নন্দীর কালজয়ী উপন্যাসের অংশ? উঁহু, ছুটির দিন আর রোববার পাড়া মাতানো (এই ব্যাপারে দক্ষিণকে দশ গোল দিয়েছে উত্তর আর মধ্য কলকাতা) ১০ ওভারের ক্রিকেটের, যার উন্মাদনা যেকোন বড়সড় ক্রিকেট ম্যাচকে হার মানাবে। গলি ক্রিকেটের দু-একটা মুখিত (লিখিত হলে মুখিত কি দোষ করল? কথিতটা বড্ড বাজে) নিয়ম আছে।

দেওয়ালে ড্রপ খেয়ে ফিল্ডারের হাতে পরে আউট হলে আল্যান আইসাকেরও সাধ্যি নেই ভুরু কোঁচকায়, তেমনি পাড়ার সুন্দরীরা রাস্তায় বেরুলে খেলা আপনি থেমে যায়, মানে 'ওনার গায়ে লেগে টেগে যেতে পারে কিনা'... তবে সবচেয়ে বড় মুন্সিয়ানা ঠিকঠাক 'উইকেট' তৈরি করাতে, অলিখিত প্রথা অনুযায়ী আধলা ইঁটের টুকরো দিয়ে বানানোই দস্তুর, যদিও প্রকারভেদে চ্যালা কাঠ বা মোটরের ব্যাটারির বাক্সও চলতে পারে... তবে কিনা বাঙালী এককালে অনেক বুদ্ধিশুদ্ধি জমিয়েছিল তাই বিবর্তনের জাঁতাকলে পরেও দুএকজন বিরলবাদীর মাথা থেকে বেরোয় বালতি বা অব্যবহৃত জলের ড্রাম দিয়ে উইকেট বানানোর আইডিয়া। আক্রমের চেয়েও জোরে(!) করা ফুলহ্যান্ড বল উইকেটে লাগেনি এই অভিযোগ যাতে বিপক্ষ দল না তুলতে পারে তাই এই ব্যবস্থা... এই দেখ বলের ধাক্কায় একটু জল চলকে পরেছে রাস্তায় যতই সেটা উইকেট ঘেঁষে বেরিয়ে যাক। সত্যি এসব দেখেও কি আইসিসি কিছু শিখতে পারে না?

জুন ৫, ২০১৪

নাঃ, আজ কোন মোবাইলে ব্ল্যাক আউট ডে নেই। নেটওয়ার্ক কর্তার জানেন, আজ তেমন কেউ বেশী এসএমএস পাঠাবেন না। আজ কোন নববর্ষের সূচনা নেই, ভালোবাসা-বন্ধুত্বের উদযাপন নেই, এমনকি তেমন কোন মহাত্মার জন্ম বা প্রয়াণ দিবসও নেই। তবে?

সকালবেলা গুগল কিছু ডুডল বানায়নি বলে খেয়ালই হয়নি অনেকের। আসলে শহর কলকাতায় এক পাগল বাস করেন। ময়দান থেকে বইমেলা সরাতে ভদ্রলোক একা লড়ে গিয়েছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তারপরেও কখনও শহরের রাস্তা থেকে বিষনিঃশ্বাসী যান হঠাতে, কখনও বটানিকাল গার্ডেন, কখনও রবীন্দ্র সরোবরকে বাঁচাতে দমাদ্দম কেস ঠুকে দিয়েছেন হাইকোর্টে। কিসের আশায়? খ্যাতি? টাকাপয়সা? মিডিয়ায় মুখ? জানা নেই। তাঁর নাম সুভাষ দত্ত, আমাদের 'কেয়ার করি না' শহরে একটি বেমানান মুখ। আরে না না মশাই, আপনাকে পাগলামি করতে উপদেশ দিচ্ছি না। প্রকৃতিপ্রেমী নয়, প্রকৃতিরসিক হয়েই থাকুন বরং। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যোদয় বা বাথরুমে তোলা সেলফি

পোস্টানোর ফাঁকতালে যদি ভালো লাগে, কয়েকজনকে জানিয়ে দেবেন, আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সেই অজুহাতে আপনি না হোক, কেউ হয়তো একটা চারাগাছ পুঁতবেন একচিলতে জমিতে, প্লাস্টিক চাইবার আগে দু'বার ভাববেন, একদিনের জন্য হলেও।

জুন ৬, ২০১৪

সব সত্যি, নীলকমলের চীনে পাড়া সত্যি হলদে চামড়ার দাঁত বেরনো বদমাইশ জাপানী, দুমদাম বিপ্লব হওয়া দক্ষিণ আমেরিকা,শয়তান ধনকুবের ইহুদি,কালো বেলজিয়ান...সঅঅঅব সত্যি... লিন ক্লেয়ার শৈলীতে আঁকা পরিপাটি জগতের বাচ্চা ছেলেটা সেইসব সত্যি খুঁজে বের করে। একদণ্ড তিষ্ঠনোর সময় নেই তার... সেই আলজিরিয়া থেকে আমেরিকা টোটো (totor নয় কিন্তু!) করা টিনটিনও কি খানিকটা স্টিরিওটাইপ? ইউরোপিয়ান সুপ্রিমেসির প্রতীক? হবেও বা... তাই হয়ত তার সত্যসন্ধান বেশিরভাগই হয় তৃতীয় বিশ্বর দেশেগুলোতে, দুষ্টু লোকেরা কখন হোঁৎকা ইহুদি কখনও বা দাঁত বের করা জাপানী। কঙ্গোয় তাই হয়ত টিনটিন দমাদ্দম গণ্ডার,সিংহ মারে, গাড়ির ধাক্কায় ওদেশের ফঙ্গবেনে ট্রেন উল্টে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম দেয় ট্রেন তুলতে, তাকে গড় করে কালো আদিবাসী মহিলা; আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে কুট্টুসকে বলে "দেখ কুট্টুস, সত্যিকারের রেড ইন্ডিয়ান !" হার্জও অত না ভেবেচিন্তে জোসেফ কোনার্ডের বর্ণনা মত এঁকে দেন আফ্রিকানদের "faces like grotesque masks," as animal-like creatures who lap water like animals, with ugly and horrid faces, who howl and leap

around, with buttocks wagging “to and fro like tails.” একই গল্পে কুট্টুস বলে "পাদ্রীদের জবাব নেই" টিনটিনও ক্লাস নিতে গিয়ে বলে "এইবার বাচ্চারা আমি তোমাদের দেশ বেলজিয়াম সম্পর্কে কিছু বলব।"

রাশিয়ান বলশেভিকদের সাচ্চাঝুটা গপ্পে টিনটিন তাদের 'ইলেকশন' দেখে বেড়ার উপর থেকে (টিনটিন তো সভ্যতর ইউরোপের প্রতিনিধি, একটু 'উঁচু' জায়গায় তো তাকে রাখতেই পারেন রেমি)... দলাই লামা তাকে যতই লাইট অফ ট্রুথ বলুন, টিনটিন কে নিয়ে এইসব বিতর্কের ঝড় উঠেছে বারবার।ফরাসি দেশের পার্লামেন্ট তোলপাড় হয়ে গেছে তার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে।

কিন্তু এ সবই স্রেফ কথারই কথা, এই বেঁটে বেলজিয়ানকে (অ্যারাকুল পোয়ারো নন) এত কিছুর পরও দূরে সরিয়ে দিতে পারবেন কি?

হার্জ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন ব্যাপারখানা, নইলে তাকে 'আমার কৈফিয়ত' (পড়ুন নীলকমল) লিখতে হয় ?

তীব্র সমালোচনার মুখে পরে হার্জকে পরে অনেক সংলাপই বদলাতে হয়...

জুন ৭, ২০১৪

এ চলবে না, এ চলবে না।
যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।
কিন্তু, নিয়ম!
বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।
ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে ব'লে বসল, এগোব।
নইলে চলা কিসের জন্যে।
চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম।
নিয়ম বড় সোজা নয়, তাই ইরম শর্মিলা চানুর নাকে দিবারাত্র নল গোঁজা। রাষ্ট্রের অধিকার আছে তার অনশনকে আত্মহত্যার প্রচেষ্টার তকমা লাগানোর। সে যে রাষ্ট্রদ্রোহী। সে যে চায় না রাষ্ট্র মানুষকে ধর্ষণ করুক। কেন চাইবে না? কেন? কেন? ঠেসে ধরে নল গুঁজে দাও তার মুখে। খাবে না? অনশন করবে? এইসব অ্যালাও না মোহনদাসের দেশে। অনাহারে মরুক, কিন্তু অনশনে যেন একটা মানুষও না মারা যায়। যদি... যদি আগুন জ্বলে ওঠে? আরো একবার?

জুন ১০, ২০১৪

দূরপাল্লার ট্রেনের কামরায় ঢুকলে কেমন একটা 'ঘুরতে যাব, ঘুরতে যাব' গন্ধ থাকে, এখানে সে গন্ধ নেই। ডেটল আর কড়া কড়া ওষুধের গন্ধে ম-ম করছে কামরা। যাত্রীদের বেশীরভাগের শরীরেই বাসা বেঁধেছে কোন না কোন মারণ রোগ। জীবনের শেষ পুঁজিটুকু সঙ্গে নিয়ে তাদের যাত্রা দক্ষিণপন্থী। ট্রেনের মধ্যেই কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন কেউ, কোনমতে সামলে নেন পরিজনরা। কারো চোখে শূন্য দৃষ্টি। দু-তিন বছর ধরে নিয়মিত যাতায়াতে অনেকে ক্লান্ত। বাইরের বদলে যাওয়া দৃশ্য, মানুষজন, খাবারদাবার, আর চোখ টানে না। প্যান্ট্রি কারের অখাদ্য খেয়ে দুটো দিন কাটিয়ে দেওয়া কোনমতে। যাওয়ার পথে সহযাত্রীকে কেউ একগাল হেসে জিজ্ঞেস করে না, কোথায় যাচ্ছেন? কারণ সব্বাই জানেন তাদের গন্তব্য তামিলনাড়ুর একটি বিখ্যাত হাসপাতাল। সেরে ওঠার আশা নিয়ে, মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রাণপণ বাঁচার শেষ চেষ্টায়। শ্মশানের শান্তি আর একদল মনমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অবশেষে কাটপাডি স্টেশনে পৌঁছায় মনখারাপের এক্সপ্রেস। সি-ফেসিং নয়, হাসপাতাল
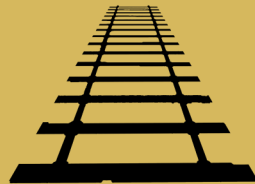
ফেসিং ঘরের প্রশস্তিতে মুখর হয় অটোওয়ালারা। একে একে সব্বাই চলে যায়, ট্রেনটা রওনা দিয়েছে আগেই। আবার আসবে কাল, একগাড়ি উন্মুখ বাঙালীকে সঙ্গে নিয়ে। তার পোশাকি নাম হাওড়া-যশোবন্তপুর সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। টিকিটের দালাল কিংবা যাত্রীদের কাছে 'পেশেন্ট এক্সপ্রেস'।

জুন ১৩, ২০১৪

এ যে দৃশ্য দেখি অন্য...
সে এক দুর্গম বৃষ্টি-অরণ্য। পদে পদে ভয়, জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডা। যেখানে পা দিলাম, হয়তো আগে কোনদিন মানুষের পা পড়েনি সেখানে। যেখানে পা দেব, সেখানে অপেক্ষা করে আছে নতুন বিস্ময়। সে অরণ্যের পা ধুইয়ে দেয় মন্দ্র আটলান্টিক। অরণ্য কেটে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে স্বচ্ছতোয়া নদী। সেখানে গিজগিজ করছে মানুষখেকো পিরানহা, হাঙর আর ডলফিন। বিস্তৃত জলপ্রপাত ব্যারিটোনে বাঁধা। সে এক আশ্চর্য স্বর্গরাজ্য - গম্ভীর, মগ্ন। সেখানের মানুষ পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে। বেশীরভাগ মানুষের এবেলা খাবার জুটলে ওবেলা জোটে না। সেখানে মানুষ ফুটবল আর সাম্বা ধুয়ে জল খায় না। তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য ভাত, অনেকটা আমাদের মত। আবার অনেকটা নয়ও আমাদের মত।
আমার ব্রাজিল মানে শুধুই ফুটবল নয়।

জুন ১৪, ২০১৪

কার বাছার জোটেনি দুধ,
শুকনো মুখ তৈরি হও
ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই,
বুট বাঁধো তৈরি হও
তাই গ্রাম নগর, মাঠ, পাথার,
স্টেডিয়ামে তৈরি হও
সলিল চৌধুরীর 'শপথ'-এর দু-একটা শব্দ বদলালে
কবিতাটা এখনো বেশ প্রাসঙ্গিক... নয় কি?

জুন ১৬, ২০১৪

সাত ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে তারা এসেছিল আমার কৈশোরে। এসেছিল চিতোরের বীর, শোলাঙ্কি রাজকুমারী। ভীল বালককে বুকে টেনে নিয়েছিল রাজপুত। সম্মানরক্ষায় জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন রাজরাণী। প্রতিশোধস্পৃহায় মহাপরাক্রমী শত্রুর মাথা কেটে এনেছিল রাজকুমার। প্রতিদিন পায়রার যাওয়া আসা। গলার কাছটা কি যেন আটকে যেত কখনও, কখনও সূর্যাস্ত অন্য মানে শিখিয়ে যেত। যুদ্ধ, রক্তপাত কখনও বদলে দেয়নি কাঁচা মনকে, কাছে টানবার জন্য প্রয়োজন হয়নি যৌনতার। গম্ভীর দুর্গের কোন এক খুপরিতে বসে তুলি দিয়ে গল্প এঁকেছিলেন অবিন ঠাকুর। আঁকতেন, প্রতিবার, অনায়াসে।

আজকের কিশোর গোগ্রাসে গেলে Game of Thrones, অবহেলায় পড়ে থাকে আমাদের রাজ কাহিনী। রাজপুতানার পথে গোহ-বাপ্পাদিত্যকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে হয় Stark-Lannister সেনাপতির জন্য। কোন নামজাদা পরিচালক হয়তো কোনকালে অমন যত্ন করে টিভি সিরিজ বানাবে না আমাদের গরীব দেশে, কিংবা আটকে দেবে আমাদের

সেন্সর বোর্ড, ভায়োলেন্সের ছুতোয়। দেশে বিদেশে ডাউনলোড-ফ্যানডমের ঝড় উঠবে না। তবু আমৃত্যু মাটির কাছে কান পাতলে শোনা যাবে ভীল বাঁশির সুর- মনে হবে আরবার, আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ...।

জুন ১৮, ২০১৪

ব্যাপারখানা কী? বিখ্যাত ব্যান্ডের গান আর হঠাৎ জনপ্রিয়তা পাওয়া ভুঁইফোঁড় দক্ষিণী সঙ্গীত কী আমাদের মত ইস্টুপিড আম আদমির একচেটিয়া অলিগোপলি? না না, এমন মাথার দিব্যি দেয়নি কেউ। তারা সামাজিক হাড়গিলে (sarcasm গুলো বুঝতে শিখুন এইবার) কিংবা আরও 'ভালো' করে বলতে গেলে পথ-রক্ষক বলে শিল্পী মননের অভাব আছে নাকি? তাইতো জন, পল, রিঙ্গো, জর্জ দের অ্যাবে রোড কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় এসে মেশে এক জেব্রা ক্রসিং-এ, নর্দার্ন অ্যাভিনিউতে সাদার্ন কোলাভেরি ডি বলে দেয় রাস্তাটা ফরমুলা ১ এর জন্য নয় মোটেই। helmet-hell met এর পিছনে কাজ করে পাকা মাথা । ১১২ মাইনেতে কি আর শিল্পীসত্ত্বা বাজেয়াপ্ত হয়? সে বাইরের আবরণী (পড়ুন উর্দি) ছেড়ে বেড়িয়ে এসে (দাঁত, নখ খিঁচিয়ে নয় অবশ্য) প্রকাশ পেতে থাকে সাবধানী হোর্ডিং-এ।

সতর্কতার মোড়কেই এই ছোটোখাটো বেনিয়মগুলো বেঁচেবর্তে থাক কলকাতা শহরের বুকে, সিগন্যালের ঠিক নীচে, ডি কে লোধকে আড়াল করে। অফিস ফেরার পথে, তুমুল ব্যস্ততায় বা আলস্যে, একবার, একবার তো তুমি চোখ তুলে তাকাবেই।

জুন ১৯, ২০১৪

বাঙালী যুবককে স্বাবলম্বী হতে গেলে নাকি তিনটি কর্তব্য মাস্ট, বেকার জীবনে একটি প্রেম করা, লোকাল ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা আর জীবনের অন্তত একটি বছর হস্টেলে থাকা।

প্রথম দুটো নিয়ে পরে কথা বলে যাবে খন। আপাতত হস্টেল লাইফ নিয়ে দুইখান কথা আছে। হস্টেল একটা অতিকায় দিল্লীকা লাড্ডুর মত, সেঁধোবার সময় প্রবল উৎসাহ, ক্রমে বেরোবার জন্য তার ডবল ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি, অনেকটা পাবলিক টয়লেটের মতও। কথিত আছে, হস্টেলের রান্নার বিশেষ ফর্মুলা আমাদের কোরাপটেড দেশে IRCTC র কাছে বিপুল টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। হৃষ্টপুষ্ট চালের ভাত, ঘোলা জলে দু তিনটে ডালের দানা, রহস্যময়ী সবজি আর ওয়াক ওয়াক মাছ বা ডিম। তিনবছর এই ডায়েটে থাকলে আপনার স্লিম হওয়া ঠেকায় কে? আর ঘরে 'দড়িতে ঝুলে থাকে ভিজে জামা, টাকা পাঠাচ্ছে না মেজমামা'। একজনের খবর জানতাম বহুকাল পর্যন্ত তার ঘরে ঢোকার একমাত্র অবলম্বন ছিল পাইপ। কারণ

ঘরের চাবিটা হারিয়েছে আর ওয়ার্ডেনকে সে কথা বলা মানেই মহা ক্যাচাল। মুনিঋষিরা লিখে গেছে, ভালো ওয়ার্ডেন যদিও বা পাওয়া যায়, সুপারকে ভালো হতে নেই। তিনি একটি কিলবিশসম ক্যারেকটার। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার চরিত্রের দোষ বর্তমান আর সেটি নিয়ে একদিন ব্ল্যাকমেল করবে বলে সবাই সান্ত্বনা পায়। সুবোধ বালক হস্টেলে ঢোকে গ্রুপ স্টাডি করার ইউটোপিয়া নিয়ে। সেই ভুল ভাঙতে ম্যাক্সিমাম এক সপ্তাহ। ওখানে পড়াশুনা হতে নেই, তাস, কাউন্টারস্ট্রাইক, বিড়ি এসব তো হস্টেলেরই মনোরঞ্জনের জন্য। কেউ প্রথমে হোমসিক, তারপর এই তুমুল মজাদার পৃথিবীতে সেও একটা ক্যারেকটার হয়ে যায়। নতুন গালাগালি আর অনেক নিষিদ্ধ কিছু শেখার পাশাপাশি হয়তো শেখে পাশে থাকতেও। প্রথম র‍্যাগিং-এর দিন সাবধান করে দেয় অন্যকে। পাশের বেডের জুনিয়ারটার জ্বর হলে, দোকান থেকে ওষুধ এনে দেয় ঠিক। ওর যে মা নেই, বাবা উত্তরপ্রদেশে। সেই পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাবে। বাড়ি যাবে সব্বাই দল বেঁধে। পুজোয় কলকাতার রোশনাইয়ের হাতছানি এড়িয়ে, কটা দিন অন্যরকমভাবে থাকতে, আদর পেতে। আবার কিছুদিন পরই মিস করে ওই নরকের মত জায়গাটাকে,

মন টেঁকে না বাড়িতে। হয়তো জায়গাটাকে নয়, বন্ধুদের, সান্ধ্য আড্ডাগুলোকে। যখন বেরিয়ে আসে শেষমেশ, সে এক আলাদা মানুষ, বড়ো মানুষ। যত কষ্ট হোক, তবু বেরোবার সময় মনে পড়ে দারোয়ানের পোষা বেড়ালটার কথা, দেয়ালে লিখে রাখা গোপন নামের কথা। ওখানে, ওখানে তার বয়ঃসন্ধি পড়ে আছে যে।

জুন ১৯, ২০১৪

বর্ষণ মুখর এক মেঘলা দিনে উদাসী এক ঝাপটা হাওয়া এসে মনটাকে অনেক কাল আগের ফেলে আসা দিনগুলোয় ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। ঝোড়ো হাওয়ার সাথে ঘুমোতে যাওয়ার রাত, সকালে উঠে বাড়ির সামনে হাঁটু জলে কাগজওয়ালার বাড়ি বাড়ি কাগজ পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। ‘আজ কাগজের গাড়ি আসতে দেরী করল দাদা, কাল থেকে যা বৃষ্টি...’ । পাড়ার সামনে হাফ-প্যান্ট পরিহিত মধ্যবয়স্ক রমেন কাকার বাজারের থলি সামলে দেঁতো হাসি, ‘আজ যা দেখছি... খিচুড়ি ছাড়া গতি নেই।’ সামনে দিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল জলের মধ্যে ফুটবল খেলতে নামা ছেলেগুলোকে কাক ভেজা করে দিয়ে। ‘আজ আর কলেজ যেতে হবে না ছেড়ে দে...’, ‘তুমি বুঝতে পারছ না, আজ এই দিনে একসাথে কলেজ এর মাঠে খেলার মজাটাই আলাদা...’ পাশের বাড়ির কাকিমার গলা আরও এক ধাপ ওপরে চড়ল বলে...

হঠাৎ ঘনিয়ে আসা মেঘ ও গর্জনে, নিমেষে পাল্টালো সব তোড়জোড়, কেউ পালাল

চায়ের দোকানের তেরপলের তলায়, কেউ বা ছুটল বাড়ির দিকে, কেউ আবার জায়গা করে নিল কোন দোকানের অন্দরে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির সাথে কানে ভেসে এলো একটা গান, ‘এমনও দিনে তারে বলা যায়...’, হয়ত রেডিও থেকে, হয়ত বা মনের মধ্যে থেকেকেই...। ফাঁকা ময়দানে ‘তার’ হাত ধরে ভিজে উষ্ণ হওয়া, অথবা গঙ্গার ঘাটে এক ছাতার তলায় ‘আজি তোমায়ে আবার, চাই শুনাবারে...’

কেমন আছেন প্রবাসীরা? বর্ষাটা নিশ্চয়ই বেশ অন্যরকম ওখানে? বাংলার ‘খিচুড়ি-বর্ষা-রবিঠাকুর’-এর থেকে বেশ আলাদা রকমের এক বৃষ্টিতে ভিজে কি কোনদিনও মনে পড়বে না সেই ছোট্টবেলায় নৌকো ভাসানোর কথাটা? আজ মন বড়ই চঞ্চল। সে চেয়েছে আজ হারিয়ে যেতে, আমার বাংলায়, শস্য শ্যামলা বাংলায়...

‘আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, হারিয়ে যাব আজ তোমার সাথে...’ ... আরো কত কি...

জুন ১৯, ২০১৪

"আমার বাচ্চার কৃতিত্ব সবাই নিতে চায়, কিন্তু আমার বাচ্চা কি চায়?"

শুধুই অ্যাডে দেখানো বুদ্ধি-বর্ধক, উচ্চতা-বর্ধক বাদাম-ই (রং নয় কিন্তু) পানীয়? বাচ্চা কি চায় সত্যি জানতে হলে কখনো তাকে সরকারি অফিসের বহুতাক সদৃশ বহুতলগুলির লোক ঠকানো কৃত্রিম ঘাসের 'প্লে গ্রাউন্ড' এর বদলে ধুলো-কাদা সমন্বিত সত্যিকারের মাঠে নামতে দিন। ৭, ৭টি দিনের ভবিষ্যতের চূড়ান্ত সফল হবার লক্ষ্যে ঝাঁপানো ছাড়াও খুদে মননটির থেকে নিংড়ে বের করে আনা 'প্রতিভা' তে শান দেবার ব্যস্ত কর্মসূচীর বাইরে তাকে নিজস্ব উদ্ভাবনীর দেশলাইটুকু জ্বলে ওঠার নিজস্ব মুহুর্তটুকু দিন, কারণ বারুদের স্তুপের জন্য একটা আপাত তুচ্ছ ফুলকি যথেষ্ট।

বিজ্ঞাপনী মা এবং বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত মায়েদের উদ্দেশ্যে

জুন ২০, ২০১৪

টং- এর ঘর থেকে (ঘনাদা উবাচ)

সেদিন এরকমই এক বর্ষার দিনে ওই টং-এর ঘরে বসে ঘনাদার সাথে আড্ডা দিচ্ছি, আর তার দুর্লভ দুর্ধর্ষ কাহিনী শুনছি... সাথে জলযোগের জন্য ছিল মুড়ি, চপ, বেগুনি... হঠাৎ ঘনাদা চপটা খেতে খেতে আনমনা হয়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে উঠলেন 'ভাগ্যিস ক্যানিং এলো'। একটা ইতিহাস চাক্ষুষ শোনার লোভ সামলাতে পারলাম না, জমে গেল আড্ডা, চলল সেই রাত অবধি... জানা গেল অনেক না-জানা অজানা কথা... "ভাগ্যিস ঘনাদা ছিলেন "..

যা জানলাম সেটাই এখানে বলি... লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন, কিছুদিন পর লেডি ক্যানিং-কে ভারতে আনবেন বলে ঠিক করলেন। আমরা বাঙালীরা এমনিতেই অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্য সব সময় মুখিয়ে থাকি। তাই লেডি ক্যানিং এর জন্য তৈরী হলো ইস্পেশাল মিষ্টি... সেটার বাঙালী নাম 'পান্তুয়া'। যেহেতু লেডি ক্যানিং-এর জন্য বানানো ,পান্তুয়ার নামটা বাঙালীদের কাছে পাল্টে 'লেডি ক্যানিং' হয়ে যেতে লাগলো... শেষ পর্যন্ত সেটা

হয়ে দাঁড়াল ‘লেডি কেনি- লেডিকেনি’, এই দেখে বাংলার যত চপ বিক্রেতা ছিল তারাও ভাবলো ‘আমরা সবাই রাজা, সাজে না মোদের পিছিয়ে থাকা’, যতই হোক চপ কাটলেট আমরা শিখলাম তো সেই ইউরোপীয়দের থেকেই। যেমন ভাবা তেমন কাজ, চপ, কাটলেট, বেগুনি নিয়ে যাওয়া হলো ওনার কাছে। উনি সব কিছু খেলেন আর সব কিছুর নাম জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। নামগুলো ওনাকে ইংরাজিতে বলে দেওয়া হলো, সব শেষে খেলেন বেগুনিটা। সেটা ইংরাজি করে বলা হলো ‘violet’ ঘাবড়ে গেলেন লেডি, ‘violet তো একটা রঙের নাম, তক্ষুনি ওনাকে বোঝানো হলো ওটা আসলে ‘Brinjal fried on oil’ বা ‘তেলেভাজা’ সেই থেকে বেগুনির আর এক নাম তেলেভাজা ।

(হন্ডুরাসের প্রত্যন্ত জঙ্গলের এক দুর্গম গুহায় পড়েছিল একটি চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ ঘেঁটে পাওয়া গেল, কিছু হজমি বড়ি, ১ টা চ্যবনপ্রাশ এর শিশি, বেনীমাধব শীলের পঞ্জিকা, পৃথিবীর একটা ম্যাপ ও একটা ডায়েরি, নাম লেখা ‘সুধীর’, ব্যাগের গায়ে লেখা ‘ঘনশ্যাম ড্যাশ’... আমাদের লেখাটা সেই ডায়েরি থেকেই নেওয়া। ‘লাইক’ পাওয়ার অধিকার তাই আমাদের নেই। ওটা পারলে ৭২ নম্বরে ভেট পাঠিয়ে দেবেন।)

জুন ২২, ২০১৪

একটা ঘুপচি ঘরের মধ্যে একটা ছেলে বসে আছে, চেয়ারে নয় মেঝেতে, পা ছড়িয়ে... তার সামনে স্তুপীকৃত ভিডিও ক্যাসেট, সিলিং-এর নীলচে সাদা আলোয় ছেলেটা একটা একটা করে ক্যাসেট তুলে দেখছে পরক্ষণেই মাথা নেড়ে নামিয়ে রেখে দিচ্ছে। একটানা দশ মিনিট ধরে ঘাড় নিচু করে ভিডিও ক্যাসেট ঘেঁটে এইবার মাথাটা তুলল ছেলেটা। দু-পাশে হেলিয়ে কটকট করে আড় ভাঙল, সবচে উপরের তাকটা চোখে পড়ল এইবার। কয়েকটা মাত্র ক্যাসেট সেখানে, বোধহয় অ্যাকশান ফিল্ম সব নিচের দিকে থাকে বলেই উপরের তাকে বিশেষ কারও হাত পড়ে না। চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাতে দাঁড়িয়ে হাত পেল সে, বয়স বছর পনের হলেও চেহারাটা বাড়েনি সেই তুলনায়, অতটা তার এমনিতেও হাত যেত না, যে কটা হাতের কাছে পেল নামিয়ে নাম গুলো পড়ল, ইংরিজি নয়, অচেনা হরফ, তবে ইংরিজিতেও নামটা লেখা আছে, সেই সঙ্গে পাশে ছোট করে পরিচালকেরই নাম, 's-at-ya-zit ray' ভেঙে ভেঙে পড়ল নামটা, কি মনে হতে বাড়িতে নিয়ে গেল সেই ক্যাসেটটাই, হয়ত নামটা চেনা লেগেছিল।
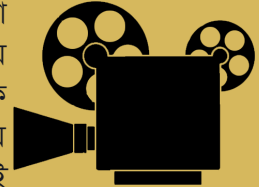
তিন কন্যা ভিডিওটা পাওয়ার পর থেকে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিই দেখে ফেলেছে ছেলেটা, লোকটার ভাষা সে বোঝেনা, তাই দারুণ ঝরঝরে ইংরিজিতে লেখা সাব-টাইটেলই ভরসা, তবু লোকটার ক্যামেরার কাজটা তাকে কেমন যেন একটা টানে... ইন্ডিয়ানরা শুনেছে ম্যাজিক জানে সব্বাই, এও কি সেরকম কোনও জাদু?

বেশ কয়েকটা ছবি বানিয়ে ফেলেছে সেই ছেলেটা, চূড়ান্ত সাফল্য চরম ব্যর্থতা দুটোই পেয়েছে। কিছুটা যেন ক্লান্তই সে, বাড়িতে বসে ছবি দেখা ছাড়া কোনও কাজেই যেন উৎসাহ নেই তার... খুঁজে পেতে সে আরেকটা ছবি পেয়েছে সেই লোকটার; ছবিটার নাম, The Golden Fortress... দেখতে দেখতে কেমন জানি উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে... সেকি নিজেরই বানানো ছবি দেখছে? নইলে ফেলুদারা রাজস্থান পৌঁছনোর পর থেকেই color scheme ব্যবহারে এত তার ছাপ কেন? অদ্ভুত তো... লোকটার কয়েকটা ছবি জোগাড় করে দেখে ফেলে সে, The Elephant God নামের একটা ফিল্ম দেখতে দেখতে আবার চমকে ওঠে সে, না এইবার কালার স্কিম নয়, চমক অন্য জায়গায়, ছবিতে সারা জায়গায় ছড়ান সিমেট্রি আর জিওমেট্রিক ছন্দ... পুরনো ছবিগুলো আবার দেখতে শুরু

করে। হ্যাঁ... এইতো... সেই জিওমেট্রিক আমেজ, সেই স্কিম... লোকটার বাড়িতে ফোন করে সে, লোকটাকে একটা ট্রিবিউট দিতে চায়...
কদিন পরেই কলকাতা, পাঁচ সাতদিন থেকে কাজকম্ম সেরে সে ফিরে যায়... গন্তব্য রাজস্থান... তাকে আরেকবার জয়সলমিরে হারিয়ে পাওয়ার একটা গপ্প ফাঁদতে হবে যে... লোকটার বড্ড প্রিয় জায়গা ছিল এই বালি পাহাড়ের দেশ টা... আরাবল্লির পাহাড়টা কেমন বাইসেপ ট্রাইসেপ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে রোমাঞ্চ জাগে তারও।
এতক্ষণ যার কথা বলে আপনাদের আমাদের এত সময় নষ্ট কল্লাম, তাকে নিশ্চয়ই চিনে ফেলেছেন অনেকেই? হ্যাঁ ওয়েস অ্যান্ডারসন নামের বিতর্কিত চিত্রপরিচালকের কথাই বলছিলাম এতক্ষণ, আর তার গুরুদেব যে সত্যজিৎ রায় সেটা তো জেনে গেছেন অনেকক্ষণ আগেই।
তার বেশীরভাগ সিনেমাই প্রশংসা কুড়িয়েছে, কিন্তু রিভিউ করতে গিয়ে এই সেদিনও ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল লিখেছে, যে তার সাম-প্রাতিক্তাম ফিলিম আদতে সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা আর টিনটিনের কমিক্স মেশানো বিদঘুটে ভাঁড়ামো। সত্যিই তো যেখানে এতসব

গম্ভীর ব্যাপার-স্যাপার ঘটে যাচ্ছে সেখানে তার একঘেয়ে স্টপ মোশন, লাল হলদে নীল সবুজের ওয়ার্ম কালার স্কিম আর ফিউচুরা স্ক্রিপ্ট আর কি দিতে পারে? নাকি সেটাই তার উদ্দেশ্য? এতসব গম্ভীর ব্যাপারের মধ্যে আমাদের জীবনের সবচে মারাত্মক সমস্যাগুলো কি তাহলে ভয়ঙ্কর রকমের হাস্যকর?

এতসব ভেবে যদিও বিশেষ লাভ নেই... তার ফিলিমের আসল মজা তার প্লাসটিসিটিতেই, যেখানে সব কিছুই ওয়ার্ম, এমনকি মৃত্যুও!

বিঃ দ্রঃ রায়সাহেবের ভীষণ ভক্ত বলে নন, ভারত নিয়ে সত্যি মিথ্যে ছবি বানিয়েছেন বলেও নন। অঞ্জন দত্তর গানের সুর ব্যবহার করেছেন বলেও নন। ওনার ছবি দেখে সঞ্জীব চাটুজ্যের লেখা মামা ভাগ্নের গপ্পের দারুণ ভালোলাগার আমেজটা ফিরে পাওয়া যায় বলেই নয়... আজ ওনাকে নিয়ে বলতে ইচ্ছে হল তাই লেখা, কত প্রলাপই তো বকি আমরা, একদিন অ্যান্ডারসনই ভজলুম না হয়...।

জুন ২২, ২০১৪

এ অনেকটা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম না বোঝার মত, গড়পরতা বঙ্গসন্তানেরা নাকি ঝুঁকি নিতে বার তিনেক ভাবেন, অন্তত দু জন এর বিশেষজ্ঞ মতামত নেন এবং এক বার কেবল নাম শোনা, জন্ম হতে অদেখা ভগবান নামক লোকটির উপর ভাগ্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে অবশেষে কাজটির শুভারম্ভ করেন। কিন্তু ফুটপাত বেচারার ক্ষেত্রে এই ফরমুলাটিকে বাঙালি বরাবর বাদের খাতায় রেখে এসেছে। কেবল এই একটি জিনিসের বেলা বাঙালি তার আজন্ম লালিত ভীরু অপবাদটি ঘুচিয়ে সদর্পে বীর-রত্ন, বিশ্বশ্রী ইত্যাদি প্রাপ্ত নায়কের মত তা কেবল এড়িয়েই চলে না, উল্টে রীতিমত উপেক্ষা করে গাড়ি চলাচলের রাস্তাটিকেই চলার পথ হিসাবে বেছে নেয়। দুর্ঘটনা না ঘটা ইস্তক তার মর্ম দাঁতের সমান। অবশ্য সব দায়ভার একা পথচারী বেচারাদের উপর পরোক্ষ ভাবে ঝুলিয়ে তো লাভ নেই, লাভের মুখ দেখতে যারা রুটি-রুজির জন্য ফুটপাতকে প্রান্তিক উপযোগিতার সুযোগ্য উদাহরণ বানিয়ে ছাড়েন এবং তাদের ক্রম সফলতার সর্বোচ্চ মাপকাঠিটি ছুঁতে সীমিত 'পকেট-

মানি'তেই নিজেকে যথাযোগ্য আধুনিকা (ক্ষেত্র বিশেষে আধুনিক) প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে যারা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন, তারাই বা কম যান কিসে। ইদানীং প্লবতার সুত্রের সার্থক প্রয়োগ হিসাবে ৮ কোটির সমুদ্রে ভাসমান একদল উদবাস্তুদের কথাই ধরা যাক (উদ্বাস্তু মানেই যে ৬০ এর দশক নয়, এ খবর আপনিও রাখেন নিশ্চয়ই) হস্তান্ত্র আয়ের মত ফুটপাত এদের বিনামূল্যের স্থায়ী ঠিকানা, বস্তি নামক কৃষি ক্ষেত্রে কেৎরে পরা কাকতাড়ুয়ার (সন্দীপের নয়) ভূমিকায় সফল। রোজকার রোজগারের তাড়নায় চোখ এড়িয়ে যেতেই পারে, তবে বাংলার গর্বের উৎসবের দিন-রাতগুলিতে রাস্তায় পা রাখলে দলবদ্ধ হৈ হৈ এর ফাঁকে ফুটপাতগুলিতে চোখ রেখে দেখবেন, বাগেশ্রী-মালকোষ এর সাথে পাল্লা দিয়ে রাতজাগার দলে আছে ফ্যাতারু দলের ষাটোর্ধ থেকে নেংলু ...বেশভূষায় বিশেষ বদল নেই (যদিও আয়েশীরা জরির লাল জামায়, নায়কোচিত কলার তুলেন বটে), তেলচিটে জামা, রুক্ষ-লাল চুল আর অনুপস্থিত শৈশব নিয়েও অদ্ভুত চোখে চোখ ধাঁধানো আলোয় মোড়া শহরটাকে হাঁ করে গিলছে... আসলে ওই 'আলো' জিনিসটির বড়ই অভাব যে তাদের। বাঙালি আবেগের গোড়ায় সুড়সুড়ি নয়, চেনা

জায়গাও এক্কেবারে নিজস্ব অলিখিত কিছু গল্প বলে চলে, এরা আবার নব্য বঙ্গীয় (ডিরো সাহেবের নয়) উঠতি আলোক-চিত্রীদের কাছে সেরা সাদা-কালো ফুটপাত-জীবনের রঙিন চরিত্র, এক্কেবারে জীবন্ত ভাস্কর্যের মত মুখের প্রতিটা চর্ম-দন্ত বিকশিত হয়ে হাসিতে দন্তবেষ্ট (মাড়ি আর কি) পর্যন্ত ছবিতে স্পষ্ট প্রস্ফুটিত করে তবে তাদের আলোক-চিত্র সার্থক। যাই হোক, নেহাত ফুটপাত অবলা, অশিক্ষিত নয়তো এ সোনার বঙ্গদেশে এরাও 'অভিযোগকারী' হিসেবে সরকারী খাতায় নথিভুক্ত হয়ে যেত।

জুন ২৫, ২০১৪

হুশ হুশ হুশ হুশ শব্দে সে চলে এসেছিল বিপদের মাঝখানে, কোন এক অজানা পৃথিবী থেকে। এদিকে তখন ছোরা উঁচিয়ে ধরেছে গলায় রুমাল বাঁধা ছিনতাইবাজ, কিংবা পিস্তল হাতে উদ্যত কটা চোখের টাকমাথা ভাড়াটে খুনি। এক ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতায় সব্বাইকে সটান উড়িয়ে দিয়েছিল সেই মাঝবয়েসী। এক রোববার দুপুর বারোটায় অ্যান্টেনা লাগানো পুরোনো সাদা কালো টিভিটার ভেতর থেকে আমাদের গোটা শৈশব ছিনিয়ে নিয়েছিল-- শক্তিমান।

ইয়ে অদ্ভূত শক্তি হ্যায়, দুনিয়া বদল স্যাকতি হ্যায়- একহাত মাথার ওপর তুলে বোঁ বোঁ করে ঘুরে যেতে হত যতক্ষণ না মাথার ভেতরটা হিলিবিলি কাটে। এইভাবেই হয়তো একদিন বেরিয়ে আসবে লুকোনো ক্ষমতা, খোঁজ নিতে হবে মহাগুরুর। মহাক্যাবলা গঙ্গাধরের ছদ্মবেশ, সুন্দরী গীতা কিসব ইকুয়েশন গুলিয়ে দিয়েছিল মাথার ভেতরে। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সিঁড়ির তলার অন্ধকারেই লুকিয়ে রয়েছে টিয়াপাখি নাকের কিলবিশ। রোজ ইস্কুলে ঢুকেই হাতদুটো কায়দা করে বন্ধুদের অভিবাদন জানানোর নিয়ম ছিল, 'অন্ধেরা কায়েম রহে'। কেউবা ডঃ জয়কালের স্টাইলে

হাতটা মুখের সামনে ঘুরিয়ে 'পাওয়ার'। আরো কি কি সব জ্ঞানগর্ভ জিনিসও এলো। পাপমণির চক্রান্ত, ডবল রোলের শক্তিমান, গঙ্গাধরের ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় এইসব জট পাকিয়ে আমাদের লেখাপড়া শিকেয় তুলেছিলেন মুকেশ খান্না আর দিনকর জানি। কমিকস বেরিয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। শিশুর অ্যাডিকশন চিরকালই বাবা-মায়ের না-পসন্দ, তার ওপর নচ্ছার কাগজগুলো কিসব খবর ছাপত কে নাকি শক্তিমান হবে বলে লাফ দিয়েছে তেরো তলা বাড়ির ছাদ থেকে। অতএব বহু ঝোলাঝুলি করতে হত সেগুলো কেনার জন্য। গ্রামার বইটার মধ্যে তার সুরক্ষিত সহাবস্থান। কমিকস এলেও সেবার পুজোয় যে শক্তিমান জামা বেরোলো সেটা অ্যালাও হয়নি কোনদিন, প্রবল চ্যাওভাঁও সত্ত্বেও। কিন্তু দুপুর বারোটায় বসা চাই-ই চাই, স্নানের জন্য একদম তাড়া দিতে হত না সেদিন। ভাইবোন সবাই পাট করে চুল আঁচড়ে বাবু হয়ে বসে উত্তেজক এক ঘন্টা, সঙ্গে অবশ্যই পার্লে-জি। ওটা খেয়েই শক্তিমানের এতো জোর আসে যে।

কত বছর কেটে গেল প্রবল নেশাগ্রস্ততায়, খেয়াল নেই। তারপর শুরু হল আর্যমান। সেই মুকেশ খান্নাই, ভিনগ্রহের কিসব কাণ্ডকারখানা আর একটা ইয়াব্বড় তলোয়ার নিয়ে,

সেসব কিছুতেই মনে ধরলো না আর। চিরযৌবনা শক্তিমানও আস্তে আস্তে বুড়ো হতে লাগলো, তার চোখের নীচে ভাঁজটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। গল্পগুলোও আর আগের মত মন টানছে না। বয়সের দোষ না ডিরেকটরের সেসব ভালো করে বোঝার আগেই অনেকটা দূরে সরে গেল শক্তিমান, গীতা, কিলবিশ, জয়কাল সব্বাইকে সঙ্গে নিয়ে। কেবল টিভি এসে গিলে ফেলল দূরদর্শনের কৌলিণ্যকে। বারোটার রুটিনটা যে কবে থেকে বদলে গেল, মনে নেই। হঠাৎই একদিন একজন বন্ধু বল, শক্তিমান বন্ধ হয়ে গেছে জানিস? মন খারাপ লাগল না আর তেমন। যার জন্য একদিন অনেক অভিমান, বায়না, খুন্তির বাড়ি...স্বপ্ন, সে চলে গেল যোজন দূরে, হয়তো যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই। তারপর ইংরাজী অনুবাদ, রিপিট টেলিকাস্ট, কিছুই জমলো না আর। ডিটেলের অভাব, বোকা বোকা ভিসুয়াল এফেক্ট, কপিবুক সততা, বন্ধুত্ব...কিছুতেই মন টানতে পারলো না পরের প্রজন্মের। শক্তিমান পড়ে রইল, প্রথম ভারতীয় টিভি সুপারহিরো হওয়ার অহং আর আমার ঠোঙা হয়ে যাওয়া ভূগোল খাতার পিছনের একরাশ আঁকিবুকি হয়ে।

জুন ২৬, ২০১৪

ছোট থেকে বড় হওয়ার মাঝের সময়টায় আমাদের কাঁচা মনের অনেকটা যায়গা জুড়ে ছিল একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ।।রাত ১২টা বাজার সাথে সাথেই সেই রোমাঞ্চ গুলো কি করে যেন হাত পা ছেড়ে ডানা গজিয়ে কল্পনার রূপ ধারণ করে আমাদের চারি পাশে ঘুরে বেড়াত।।সন্ধের পর পাড়ার সেই সব তথাকথিত স্থানে যাওয়ার সাহস 'শক্তিমান' রূপি ডানপিটে গুলোরও ছিল না। বাঙালীদের এমনিতেই প্রধান দুটো রোগ- Diarrhea ও Nostalgia। এহেন বাঙালীর অতি-নস্ট্যালজিক হয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের বিভেদ ঘুছিয়ে কল্পনার কল্পিত রুপ ধারন করলে তাকে ভূত চর্চা আখ্যা আমরা দিয়ে থাকি। বেশী নয়, বছর দশেক আগের কথা, প্রত্যেক পাড়ায় 'তেনাদের' জন্য একটা বাড়ি নির্দিষ্ট থাকত। বাড়ির দেওয়াল ধরে গাছের শিকড় জড়িয়ে থাকাটা 'তেনাদের' অস্তিত্বটা আরও বেশী করে প্রমাণ করে দিত। পাড়ার আলোগুলো জ্বলার সাথে সাথেই সেই সব ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেলা বাড়িগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠত, সেগুলোর সামনে যাতায়াত ও আমাদের কমে যেত। সেও এক সময় ছিল, বর্ষার ঝমঝমের সাথে কারেন্ট চলে যাওয়া খুব সাধারণ ব্যাপার বলে মেনে নিতে শিখেছিলাম। হ্যারিকেনের আলো, পাসে টেবিল এ

বই খোলা, নিমেষে 'তেনারা' যেন এসে ঘাপটি মারতেন আমাদের ঘরের আলো আঁধারে। একটু তাড়াহুড়ো করেই যেন বড় হয়ে গেলাম, ছোটবেলার সেই কারেন্ট চলে যাওয়াটাও যেন আর মেনে নেওয়ার দরকার পড়ল না।বাড়িতে ঢুকল ইলেক্ট্রিক হ্যারিকেন, সেই কল্পনা যেন এক ঝটকায় চলে এলো একুশ শতকে। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই বাড়িটায় নোটিস পড়েছে, নতুন ফ্ল্যাটের জন্য তার জায়গা ও কৌলীণ্য ছেড়ে দিতে হবে। বাড়ি ভাঙার সময় পাওয়া গেল কিছু মাদক জাতীয় দ্রব্য, পুলিশ এর বুটের শব্দে আস্তে আস্তে ভেঙে যেতে লাগল শৈশবের সেই কল্পনা ও ভাল লেগে যাওয়া গল্পগুলো। এখন কলকাতার বাইরে থাকি, সময় পেলেই কলকাতায় চলে যাই, পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখাও হয়, শুধু মনটা হু-হু করে ওঠে সস্তা স্বপ্ন গিলে ফেলা ফ্ল্যাটটা চোখে পড়লে। তেনারা যে ভালই ছিলেন সেখানে, কি দরকার ছিল আরও একটু উন্নত হওয়ার? সেই ভয় পাওয়া বিকেল- রাত গুলো এক লহমায় অমূল্য হয়ে উঠল।কোথায় গেলেন তারা? এই যান্ত্রিক শহরে তাদের জন্য কি আমাদের একটুও জায়গা হবে না? শৈশবের সেই নিষ্পাপ মন আজও সেই ফ্ল্যাটের মেদহীন দেহে মুক্তি খোঁজে...

জুন ২৭, ২০১৪

ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ...হুড়...হ্যাট হ্যাট হ্যাট...পান্না ঘাস বিছানো দুটো সরু চাকার দাগ ফেলে চলা গরুর গাড়ীর পেছন তিন চারটে লিকলিকে ঠ্যাং, ডিগডিগে মুন্ডুওলা আদুল গায়ের ছেলে... দৌড় দৌড় দৌড়... এক কিমি দেড় কিমি... তারপর একফাঁকে পথের পাশেই অর্ধেক পানায় ঝপাস ঝপাস চারটে ডুব, নেড়া ঘাসের মাঠটায় কড়্কড়ে রোদে ডাংগুলি, সাইকেলের ছেঁড়া টায়ার কঞ্চি দিয়ে মেরে মেরে সারা মাঠ চষে দেদার মজা লুটে পড়ন্ত বিকেলে মুকুলে ঢিল মেরে, লিচু গাছ নেড়া করে, টালির চালের কুমড়ো কেটে সেটাকে দিব্যি পায়ে পায়ে মারতে মারতে সূর্যিটা পাটে বসলে তবে বাড়িমুখো। মায়ের হাঁকে-ডাকে যদিবা হলদে কম পাওয়ারের আলোয় সেলাই খোলা বইটা খুলে জোরে জোরে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ মুখস্ত করতে বসা এক ঘন্টার মধ্যে ঝিমুনি আসবেই... এরইমধ্যে গাঁ নিঝুম... ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ...। কন্ধকাটা বুঝি তখনই ঘাপ্টি দিত, আর থাকতো দত্যি, বোসেদের কুয়োতলায়...তখন আবার খোঁজ খোঁজ, লাঠির মাথায় শুকনো নারকেল মালায় ছোট্ট মোমবাতি গুঁজে আরও কটা বিশে, নেড়ু, ঘন্টু,

ঝুমি, পুঁটি কে জোগাড় করে চল চল পিংলের ঠাকুরমার কাছে... সেখানে গপ্পো হবে, সেই আধ পানা পুকুরের তলায় জল্কন্যার রাজপুরী, সেই ডাঙ্গুলির নেড়া যে তেপান্তেরের মাঠ, ঘোড়া ছুটিয়ে রে রে রে ডাকাতদল, ঘোর লাগে যে চোখে... আর সেই ছিপের ফাৎনা, সুতোয় মাড়ের মাঞ্জা, কেরোসিন ধার চেয়ে বনভোজন...। আর তারপর সেই ইশকুলের বেঞ্চি, ঢং ঢং ঘন্টা, বিনি পয়সার মাস্টার দাদা...আর তারপর ? তারপর "বাবু, গাঁয়ের ন'কাকার সাথে কলিকেতা যাবার ঠিক করেছি, ওখেনের মাস্টার দাদাকে বলে ইংরিজি ইশকুলে ভত্তি হ" ......। ব্যাস!! শহুরে সিমেন্টের ধুলোতে গ্রামের মাটির স্বাদ ভুলে যাওয়া, সুতোর টান টা ছাড়তে ছাড়তে ঘুড়িটাই চোখের দৃষ্টি সীমানার বহু দূর, তাপ্পর বহুদিন বাদে পা রাখতেই হু হু স্মৃতির ভিড়...। "আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে..." "তুমি গোঁসাই বাড়ির সেজ ছেলেটা না? শহুরে-যন্তুরে হয়ে এয়েচ যে, হু হু বাবা, সেবার বর্ষায় পেচল খেয়ে যে কপালে কাটা দাগ টা নেলে, তা তো এ জেবনে গেল না, ঠিক চিনিচি, তা ভায়া আমাদের তো ভুলে গেলে?" সেই ও পাড়ার রাঙা জেঠীমা, মুদি দোকানের নীলুখুড়ো, পাগলি চল্টে টা পর্যন্ত ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে। কী করে বলি খুড়ো, আমার গহনে কোন শিরাটা ফেলে গেছি এখানে, কোন জায়গাতে ভাঙা দেয়াল

জুড়ে লাল ইঁটের দাগ করেছি, কোন গাছটার মোটা গুঁড়ি খুদে লিখেছি অ আ ই ঈ ... এই শেষ ন'কাকা, আর তো হবে না, ও দেশে আমায় নাগরিক করে নিয়েছে, তবে এই আমার এ গ্রামের শেষ সকালের প্রথম আলোয় প্রথম ট্রেনটার কামরায় পা রাখার ক্ষণ হতে আমি ছিন্নমূল হলাম, সত্যিকারের ছিন্নমূল। আমার শৈশবের ওই এল-ডোরাডোটা ঐ, ঐ বহুদূরে....কোনো এক অঞ্জনার তীরে... আমরা কতজন শহুরে আদব-কায়দায় ধোপদূরস্ত (সময় বিশেষে কেতাদূরস্তও) হয়েও "আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা" সুলভ বাংলার মুখেই পিতৃ বা মাতৃকূলের প্রধান-অপ্রধান শাখা-প্রশাখাটি ছেড়ে এসেছি? অথবা আত্মীয়তা হয়ত একেবারে লতাপাতায় কোনোক্রমে ছেঁড়া ঘুড়ির লেজের শেষপ্রান্তের মত ঝুলে। এই 'আমরা' র সংখ্যার হিসেবটা শতকের বদলে সহস্রে পৌঁছালে বাঙালী সত্যিকারের ছিন্নমূল...!